শরীর ও জাতিতত্ত্ব

এখন গৌরচন্দ্রিকাটা বড্ড বড় হয়ে পড়ল; তবে দু-দেশ তুলনা করা সোজা হবে, এই ভণিতার পর। এরাও ভাল, আমরাও ভাল; 'কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দুয়ো পাল্লা ভারি।' তবে ভালোর রকমারি আছে, এইমাত্র।

মানুষের মধ্যে আছেন, আমাদের মতে, তিনটি জিনিস। শরীর আছেন, মন আছেন, আত্মা আছেন। প্রথম শরীরের কথা দেখা যাক, যা সকলকার চেয়ে বাইরের জিনিস।

শরীরে শরীরে কত ভেদ, প্রথম দেখ। নাক মুখ গড়ন, লম্বাই চৌড়াই, রঙ চুল -- কত রকমের তফাত।

আধুনিক পন্ডিতদের মতে রঙের তফাত বর্ণসাঙ্কর্যে উপস্থিত হয়। গরম দেশ, ঠান্ডা দেশ ভেদে কিছু পরিবর্তন অবশ্য হয়; কিন্তু কালো-সাদার আসল কারণ পৈতৃক। অতি শীতল দেশেও ময়লা রঙ জাতি দেখা যাচ্ছে, এবং অতি উষ্ণ দেশেও ধপধপে ফরসা জাতি বাস করছে। কানাডা-নিবাসী আমেরিকার আদিম মানুষ ও উত্তরমেরুসন্নিহিত দেশ-নিবাসী এস্কিমো প্রভৃতির খুব ময়লা রঙ, আবার মহাবিষুবরেখার উপরিস্থিত দ্বীপেও সাদা রঙ আদিম জাতির বাস; বোর্নিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ইহার নিদর্শন।

এখন আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, হিঁদুর ভেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাত এবং চীন, হূন, দরদ, পহ্লব, যবন ও খশ্ -- এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি -- এঁরা হচ্ছেন আর্য। শাস্ত্রোক্ত চীনজাতি -- এ বর্তমান 'চীনেম্যান' নয়; ওরা তো সেকালে নিসেদের 'চীনে' বলতই না। 'চীন' বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তরপূর্ব ভাগে ছিল; দরদ্‌রাও -- যেখানে এখন ভারত আর আফগানিস্থানের মধ্যে পাহাড়ী জাতসকল, ঐখানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির দু-দশটা বংশধর এখনও আছে। দরদিস্থান এখনও বিদ্যমান। 'রাজতরঙ্গিণী' নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে বারংবার দরদ্‌রাজার প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়। হূন নামক প্রাচীন জাতি অনেক দিন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল। এখন টিবেটিরা নিজেদের হূন বলে; কিন্তু সেটা বিধ হয় 'হিউন'। ফল -- মনূক্ত হূন আধুনিক তিব্বতী তো নয়; তবে এমন হতে পারে যে আযর হূন এবং মধ্য-আশিয়া হতে সমাগত কোন মোগলাই জাতির সংমিশ্রণে বর্তমান তিব্বতীর উৎপত্তি। প্রজাবলস্কি (Prjevalski) এবং ড্যুক্ ড ও আরলিয়া (Duc d' Orleans) নামক রুশ ও ফরাসী পর্যটকদের মতে তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আর্য-মুখ-চোখ-বিশিষ্ট জাতি দেখতে পাওয়া যায়।

যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম। এই নামটার উপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। অনেকের মতে -- যবন এই নামটা 'য়োনিয়া' (Ionia) নামক স্থানবাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়, এজন্য মহারাজ অশোকের পালি লেখে 'যোন' নামে গ্রীকজাতি অভিহিত। পরে 'যোন' হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দিশি কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে 'যবন' শব্দ গ্রীকবাচী নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল। 'যবন' শব্দই আদি শব্দ, কারণ শুধু যে হিঁদুরাই গ্রীকদের যবন বলত তা নয়; প্রাচীন মিসরি ও বাবিলরাও গ্রীকদের যবন নামে আখ্যাত করত। 'পহ্লব' শব্দে পেহলবি-ভাষাবাদী প্রাচীন পারসী জাতি। 'খশ্' শব্দে এখনও অর্ধসভ্য পার্বত্যদেশবাসী আর্যজাতি -- এখনও হিমালয়ে ঐ নাম ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্তমান ইওরোপীরাও এই অর্থে খশ্‌দের বংশধর। অর্থাৎ যে সকল আর্য জাতিরা প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ্।

আধুনিক পন্ডিতদের মতে আর্যদের লালচে সাদা রঙ, কালো বা লাল চুল, সোজা নাক চোখ ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ ভেদে একটু তফাত। যেখানে রঙ কালো, সেখানে অন্যান্য কালো জাতের সঙ্গে মিশে এইটি

দাঁড়িয়েছে। এদের মতে হিমালয়ের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত দু-চার জাতি এখনও পুরো আর্য আছে, বাকি সমস্ত খিচুড়িজাত,[১] নইলে কালো কেন হল? কিন্তু ইওরোপী পন্ডিতদের এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশু লাল চুল জন্মায়, কিন্তু দু-চার বৎসরেই চুল ফের কাল হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।

এখন পন্ডিতেরা লড়ে মরুন! আর্য নাম হিঁদুরাই নিজেদের উপর চিরকাল ব্যবহার করেছে। শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হিঁদুদের নাম আর্য, বস্। কালো বলে ঘৃণা হয়, ইওরোপীরা অন্য নাম নিনগে। আমাদের তায় কি?

কিন্তু কালো হোক, গোরা হোক, দুনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হিঁদুর জাত সুশ্রী সুন্দর। এ-কথা আমি নিজের জাতের বড়াই করে বলছি না, কিন্তু এ-কথা জগৎ-প্রসিদ্ধ। শতকরা সুশ্রী নরনারীর সংখ্যা এদেশের মতো আর কোথায়? তার উপর ভেবে দেখ, অন্যান্য দেশে সুশ্রী হতে যা লাগে, আমাদের দেশে তার চেয়ে ঢের বেশি; কেন না, আমাদের শরীর অধিকাংশই খোলা। আণ্য দেশে কাপড় চোপড় ঢেকে বিশ্রীকে ক্রমাগত সুশ্রী করবার চেষ্টা।

কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক সুখী। এ-সব দেশে ৪০ বৎসরের পুরুষকে জোয়ান বলে -- ছোঁড়া বলে; ৫০ বৎসরের স্ত্রীকে যুবতী। অবশ্য এরা ভালো খায়, ভালো পরে, দেশ ভালো এবং সর্বাপেক্ষা আসল কথা হচ্ছে -- অল্প বয়সে বে করে না। আমদের দেশেও যে দু-একটা বলবান্ জাতি আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, বয়সে বে করে। গোরখা, পাঞ্জাবী, জাঠ, আফ্রিদি প্রভৃতি পার্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর। তারপর শাস্ত্র পড়ে দেখ ৩০, ২৫, ২০ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যর বে-র বয়স। আয়ো, বল, বীযর এদের আর আমাদের আনেক ভেদ; আমাদের 'বল, বুদ্ধি, ভরসা -- তিন পেরুলেই ফরসা'; এরা তখন সবে গা ঝেড়ে উঠছে।

আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এরা মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে। হৃদরোগে ফুসফুস রোগে এদের বুড়োবুড়ী মরে। একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা কি প্রায় নিরুৎসাহ, বৈরাগ্যবান্ হয়? হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে আশা-বিশ্বাস পুরো থাকে। ওলাউঠা রোগী গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারোগী মরবার সময় পর্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠবে। অতএব সেই জন্যেই কি ভারতের লোক সর্বদাই 'মরণ মরণ' আর 'বৈরাগ্য বৈরাগ্য' করছে? আমি তো এখনও উত্তর দিতে পারি নাই; কিন্তু কথাটা ভাববার বটে।

আমাদের দেশে দাঁতের রোগ, চুলের রোগ খুব কম। এ-সব দেশে অতি অল্প লোকেরই নিজের স্বাভাবিক দাঁত আর টাকের ছড়াছড়ি। আমরা নাক ফুঁড়ছি, কান ফুঁড়ছি গহনা পরবার জন্য। এরা এখন ভদ্রলোবে বড় নাক-কান ফোঁড়ে না; কিন্তু কোমর বেঁধে বেঁধে, শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে, পিলে যকৃৎকে স্থানভ্রষ্ট করে শরীরটাকে বিশ্রী করে বসে। 'গড়ন গড়ন' করে এরা মরে, তায় ঐ বস্তাবন্দি কাপড়ের উপর গড়ন রাখতে হবে।

পোশাক ও ফ্যাশন

এদের পোশাক কাজকর্ম করবার অত্যন্ত উপযোগী; ধনী লোকের স্ত্রীদের সামাজিক পোশাক ছাড়া [সাধারণ] মেয়েদের পোশাকও হতচ্ছাড়া। আমাদের মেয়েদের শাড়ী আর পুরুষদের চোগা-চাপকান-পাগড়ির সৌন্দর্যের এ পৃথিবীতে তুলনা নেই। ভাঁজ ভাঁজ পোশাকে যত রূপ, তত আঁটাসাটায় হয় না। আমাদের পোশাক সমস্তই ভাঁজ

[১] সঙ্কর-জাতি

ভাঁজ, কিন্তু আমাদের কাজকর্মের পোশাক নেই; কাজ করতে গেলেই কাপড়-চোপড় বিসর্জন যায়। এদের ফ্যাসন কাপড়ে, আমাদের ফ্যাসন গয়নায়; এখন কিছু কিছু কাপড়েও হচ্ছে।

ফ্যাসনটা কি, না -- ঢঙ; মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ -- প্যারিস শহর থেকে বেরোয়; পুরুষদের -- লন্ডন থেকে। আগে প্যারিসের নর্তকীরা এই ঢঙ ফেরাতো। একজন বিখ্যাত নটী যা পোশাক পরলে, সকলে অমনি দৌড়ুল তাই করতে। এখন দোকানীরা ঢঙ [সৃষ্টি] করে। কত ক্রোর টাকা যে এই পোশাক করতে লাগে প্রতি বৎসর, তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। এ পোশাক গড়া এক প্রকান্ড বিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ মেয়ের গায়ের চুলের রঙের সঙ্গে কোন্ রঙের কাপড় সাজন্ত হবে। কার শরীরে কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্টা বা পরিস্ফুট করতে হবে, ইত্যাদি অনেক মাথা ঘামিয়ে পোশাক তৈরি করতে হয়। তারপর দু-চারজন উচ্চপদস্থ মহিলা যা পরেন, বাকি সকলকে তাই পরতে হয়, না পরলে জাত যায়!! এর নাম ফ্যাশন! আবার এই ফ্যাশন ঘড়ি-ঘড়ি বদলাচ্ছে, বছরে চার ঋতুতে চার বার বদলাবেই তো, তা ছাড়া অন্য সময়েও আছে।

যারা বড় মানুষ, তারা দরজি দিয়ে পোশাক করিয়ে নেয়; যারা মধ্যবিৎ ভদ্রলোক -- তারা কতক নিজের হাতে, কতক ছুটকো-ছাটকা মেয়ে-দরজি দিয়ে নূতন ধরনের পোশাক গড়িয়ে নেয়। পরবর্তী ফ্যাশন যদি কাছাকাছি রকমের হয় তো পুরানো কাপড় বদলে-সদলে নেয়, নতুবা নূতন কেনে। বড় মানুষেরা ফি-ঋতুতে কাপড়গুলি চাকর-বাকরদের দান করে। মধ্যবিত্তেরা বেচে ফেলে; তখন সে কাপড়গুলি ইওরোপী লোকদের যে সমস্ত উপনিবেশ আছে -- আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ায় -- সেথায় গিয়ে হাজির হয়, এবং তারা পরে। যারা খুব ধনী, তাদের কাপড় প্যারিস হতে তৈয়ার হয়ে আসে; বাকিরা নিজেদের দেশে সেগুলি নকল করে পরে! কিন্তু মেয়েদের টুপিটি আসল ফরাসী হওয়া চাই-ই চাই। যার তা নয়, সে লেডি নয়।

ইংরেজদের মেয়েদের আর জার্মান মেয়েদের পোশাক বড় খারাপ; ওরা বড় প্যারিস ঢঙে পোশাক করে না -- দু০দশজন বড় মানুষ ছাড়া; এইজন্য অন্যান্য দেশের মেয়েরা ওদের ঠাট্টা করে। ইংরেজ পুরুষরা কিন্তু খুব ভাল পোষাক পরে -- অনেকেই। আমেরিকার মেয়ে পুরুষ সকলেই খুব ঢঙসই পোষাক পরে। যদিও আমেরিকান গভর্নমেন্ট প্যারিস বা লন্ডনের আমদানি পোষাকের উপর খুব মাশুল বসায়, যাতে বিদেশী মাল এ দেশে না আসে, তথাপি মাশুল দিয়েও মেয়েরা প্যারিস ও পুরুষরা লন্ডনের তৈরি পোশাক পরে। নানা রকমের নানা রঙের পশমিনা, বনাত, রেশমী কাপড় রোজ রোজ বেরুচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাইতে লেগে আছে, লক্ষ লক্ষ লোক, তাই কেটে ছেঁটে পোশাক করছে। ঠিক ঢঙের পোশাক না হলে জেন্টলম্যান বা লেডির রাস্তায় বেরুনই মুশকিল।

আমাদের দেশে এ ফ্যাশনের হাঙ্গাম কিছু কিছু গহনায় ঢুকছে। এ-সব দেশের পশম-রেশম-তাঁতিদের নজর দিনরাত -- কি বদলাচ্ছে বা না বদলাচ্ছে, লোকে কি রকম পছন্দ করছে, তার উপর; অথবা নূতন একটা করে লোকের মন আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। একবার আন্দাজ লেগে গেলেই সে ব্যবসাদার বড়মানুষ। যখন তৃতীয় ন্যাপলেঅঁ ফরাসী দেশের বাদশা ছিলেন, তখন সম্রাজ্ঞী অজেনি (Eugenie) পাশ্চাত্য জগতের বেশভূষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর কাশ্মীরী শাল বড় পছন্দ ছিল। কাজেই লাখো টাকার শাল ইওরোপ প্রতি বৎসর কিনত। তাঁর পতন অবধি সে ঢঙ বদলে গেছে। শাল আর বিক্রি হয় না। আর আমাদের দেশের লোক দাগাই বুলোয়; নূতন একটা কিছু করে সময়মতো বাজার দখল করতে পারলে না; কাশ্মীর বেজায় ধাক্কা খেলে, বড় বড় সদাগর গরিব হয়ে গেল।

এ সংসার -- 'দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর', কেউ কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দু-শ হাত দিয়ে ধেখছে, খাটছে; আমরা -- 'গোসাঁইজী যা পুঁথিতে' লেখেননি -- তা কখনই করব না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা তো অষ্টরম্ভা; খালি চিৎকার হচ্ছে; বস্! কোণ থেকে বেরোও না --

দুনিয়াটা কি, চেয়ে দেখ না। আপনা-আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে।

দেবাসুরের গল্প তো জানই। দেবতারা আস্তিক -- আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে -- পরলোকে বিশ্বাস রাখে। অসুররা বলছে -- ইহলোকে এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকেই সুখী কর। দেবতা ভাল, কি অসুর ভাল, সে কথা হচ্ছে না। বরং পুরাণের অসুরগুলোই তো দেখি মনিষ্যির মতো, দেবতাগুলো তো অনেকাংশে হীন। এখন যদি বোঝ যে তোমরা দেবতার বাচ্চা আর পাশ্চাত্যেরা অসুরবংশ, তা হলেই দু-দেশ বেশ বুঝতে পারবে।

পরিচ্ছন্নতা

দেখ, শরীর নিয়ে প্রথম। বাহ্যভ্যন্তর শুদ্ধি হচ্ছে -- পবিত্রতা। মাটি জল প্রভৃতির দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয় -- উত্তম। দুনিয়ার এমন জাত কোথাও নেই যাদের শরীর হিঁদুদের মতো সাফ। হিঁদু ছাড়া আর কোন জাত জলশৌচাদি করে না। তবু পাশ্চাত্যদের -- চীনেরা কাগজ ব্যবহার করাতে শিখিয়েছে, কিছু বাঁচোয়া। স্নান নেই বললেই হয়। এখন ইংরেজরা ভারতে এসে স্নান ঢুকিয়েছে দেশে। তবুও যে-সব ছেলেরা বিলেতে পড়ে এসেছে তাদের জিজ্ঞাসা কর, স্নানের কি কষ্ট! যারা স্নান করে -- সে সপ্তায় এক দিন -- সে-দিন ভেতরের কাপড় আন্ডারোয়ার বদলায়। অবশ্য এখন পয়সাওয়ালাদের ভেতরে অনেকে নিত্যস্নায়ী। আমেরিকানরা একটু বেশি! জার্মান -- কালেভদ্রে; ফরাসী প্রভৃতি কস্মিন্ কালেও না!! স্পেন ইতালী অতি গরম দেশ, সে আরও নয় -- রাশীকৃত লসুন খাওয়া, দিনরাত ঘর্মাক্ত, আর সাত জন্মে জলস্পর্শও না! সে গায়ের গন্ধে ভূতের চৌদ্দপুরুষ পালায় -- ভূত তো ছেলেমানুষ! 'স্নান' মানে কি -- মুখটি মাথাটি ধোয়া, হাত ধোয়া -- যা বাহিরে দেখা যায়। আবার কি! প্যারিস, সভ্যতার রাজধানী প্যারিস, রঙ-ঢঙ ভোগবিলাসের ভূস্বর্গ প্যারিস, বিদ্যাশিল্পের কেন্দ্র প্যারিস, সেই প্যারিসে এক বৎসর এক বড় ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আনলেন। এক প্রাসাদদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন -- রাজভোগ খাওয়া-দাওয়া, কিন্তু স্নানের নাবটি নেই। দুদিন ঠায় সহ্য করে -- শেষে আর পারা গেল না। শেষে বন্ধোকে বলতে হল - দাদা, তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' হয়েছে। এই দারুণ গরমিকাল, তাতে স্নান করবার জো নেই, হন্যে কুকুর হবার যোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু দুঃখিত হয়ে ছটে বললেন যে, এমন হোটেলে থাকা হবে না, চল ভাল জায়গা খুঁজে নেই। আলাদা স্নানাগার সব আছে, সেখানে গিয়ে ৪।৫ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল হরি! সে দিন বিকালে কাগজে পড়া গেল -- এক বুড়ী স্নান করতে টবের মধ্যে বসেছিল, সেইখানেই মারা পড়েছে!! কাজেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ী চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই কুপোকাত!! এর একটি কথা অতিরঞ্জিত নয়। রুশ-ফুশগুলো তো আসল ম্লেচ্ছ, তিব্বত থেকেই ও ঢঙ আরম্ভ। আমেরিকায় অবশ্য প্রত্যেক বাসাবাড়িতে একটা করে স্নানের-ঘর ও জলের পাইপের বন্দোবস্ত আছে।

কিন্তু তফাত দেখ! আমরা স্নান করি কেন? -- অধর্মের ভয়ে; পাশ্চাত্যেরা হাত-মুখ ধোয় -- পরিষ্কার হবে বলে। আমাদের জল ঢাললেই হল, তা তেলই বেড়-বেড় করুক আর ময়লাই লেগে থাকুক! আবার দক্ষিণী ভায়া স্নান করে এমন লম্বা চওড়া তেলক কাটলেন যে, ঝামারও সাধ্য নয় তাকে ঘষে তোলে। আবার আমাদের স্নান সোজা কথা, যেখানে হোক ডুব লাগালেই হল। ওদের -- সে এক বস্তা কাপড় খুলতে হবে তার বন্ধনই বা কি! আমাদের গা দেখাতে লজ্জা নেই, ওদের বেজায়। তবে পুরুষে পুরুষে কিছুমাত্র নেই, বাপ বেটার সামনে উলঙ্গ হবে -- দোষ নেই। মেয়ে-ছেলের সামনে আপাদমস্তক ঢাকতে হবে।

'বহিরাচার' অর্থাৎ পরিষ্কার থাকাটা, অন্যান্য আচারের ন্যায়, কখন কখন অত্যাচার বা অনাচার হয়ে পড়ে। ইওরোপী বলে যে, শরীর-সম্বন্ধী সমস্ত কার্য অতি গোপনে করা উচিত। উত্তম কথা। এই শৌচাদি তো দূরের কথা;

লোকমধ্যে থুথু ফেলা একটা মহা অভদ্রতা! খেয়ে আঁচানো সকলের সামনে অতি লজ্জার কথা, কেন না কুলকুচো করা তায় আছে। লোকলজ্জার ভয়ে খেয়ে দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে -- ক্রমে দাঁতের সর্বনাশ হয়। সভ্যতার ভয়ে অনাচার। আমাদের আবার দুনিয়ার লোকের সামনে রাস্তায় বসে বমির নকল করতে করতে মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, আঁচানো -- এটা অত্যাচার। ও-সমস্ত কার্য গোপনে করা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও অনুচিত।

আবার দেশভেদে যে সকল কার্য অনিবার্য, সেগুলো সমাজ সয়ে নেয়! আমাদের গরম দেশে খেতে বসে আধ ঘড়াই জল খেয়ে ফেলি -- এখন ঢেঁকুর না তুলে যাই কোথা; কিন্তু ঢেঁকুর তোলা পাশ্চাত্য দেশে অতি অভদ্রের কাজ। কিন্তু খেতে খেতে রুমাল বার করে দিব্যি নাক ঝাড়ো -- তত দোষের নয়; আমাদের দেশে ঘৃণার কথা। এ ঠান্ডা দেশে মধ্যে মধ্যে নাক না ঝেড়ে থাকা যায় না।

ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচতে দিই। না ছুঁলেই হল! এদিকে যে নরককুন্ডে বাস হচ্ছে, তার কি? একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার। একটা পাপ এড়াতে গিয়ে, আর একটা গুরুতর পাপ করছি। যার বাড়িতে ময়লা সে পাপী, তাতে আর সন্দেহ কি? তার সাজাও তাকে মরে পেতে হবে না, অপেক্ষাও বড় বেশী করতে হবে না।